দুর্ভাগা উপমহাদেশ

প্রসঙ্গ সাম্প্রদায়িকতা ও অসহিষ্ণুতা

সন্দীপন সেন

পুনশ্চ

১. ভারতবর্ষ কাদের দেশ?

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *দুর্গেশনন্দিনী* উপন্যাসের এক প্রধান চরিত্র শশিশেখর ভট্টাচার্য তথা অভিরাম স্বামী তার ঔরসে জাত অবৈধ শূদ্রীকন্যার নাম মাহরু থেকে পালটে করেছিল বিমলা। নাম পালটানোর কারণ বিমলাই জানিয়েছিল ওসমান খাঁকে—অভিরাম স্বামীর মনে হয়েছিল মাহরু যাবনিক নাম, তাই সে তার কন্যার নাম পালটে দিয়েছিল (বঙ্কিমচন্দ্র *দুর্গেশনন্দিনী* ৬৭)। বঙ্কিমের এই উপন্যাসের বৃত্তান্ত আজ থেকে প্রায় ৪৫০ বছর আগের, যখন দিল্লিতে আসীন ছিলেন মোগল বাদশাহ আকবর। এত বছর পরে ভারতবর্ষে তথাকথিত 'যাবনিক' নাম পালটানোর হিড়িক আবার শুরু হয়েছে, যেমন মোগলসরাই রেলস্টেশনের নাম হয়েছে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন, এলাহাবাদের নাম হয়েছে প্রয়াগরাজ, ফৈজাবাদ জেলার নাম হয়েছে অযোধ্যা ইত্যাদি। শোনা যাচ্ছে হায়দ্রাবাদ শহরের নামও না কি পালটানো হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নাম পালটানোর পক্ষে অপ্রত্যক্ষভাবে যুক্তি হিসেবে হাজির করা হচ্ছে অভিরাম স্বামীর যুক্তিকেই—এ নামগুলোতে যবন, অর্থাৎ মুসলমানের, ছোঁয়া আছে—তাই নামগুলো পালটানো জরুরি। এও শোনা যাচ্ছে যে উত্তরপ্রদেশের মজফ্ফরনগরের নামও না কি পালটে লক্ষ্মীনগর করার দাবি জানানো হয়েছে। অবশ্য শুধু দেশের জায়গার নাম পালটানোই নয়, দেশের ইতিহাসের অংশও মুছে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে—অনেকেরেই স্মরণে আসবে যে অতি সম্প্রতি ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে মোগল যুগকে বাদ দেওয়ার একটি উদ্যোগ শুরু হয়েছে, যা খুবই বিস্ময়কর ও দুর্ভাগ্যজনক। এভাবে দেশের ভূগোল ও ইতিহাস পালটে দেওয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে।

বলা বাহুল্য, এসব কর্মকাণ্ডের সপক্ষে যে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে, তার মধ্যে যেন একটা বিশেষ মনোভাব দেখা যায়। মনোভাবটা হলো এই যে আমাদের দেশ

শুধুমাত্র হিন্দুদেরই দেশ, মুসলমান শাসক এখানে অন্যায়ভাবে শাসন ও শোষণ করেছিল, দেশের অনেক মানুষকে মুসলমান ধর্ম নিতেও বাধ্য করেছিল—কিন্তু এখন আর দেশে মুসলমানের চিহ্ন রাখা চলবে না, সুতরাং সব নাম পালটাতে হবে। এই মুসলমান-বিরোধী মনোভাব থেকেই ভারতের বীর সন্তান টিপু সুলতান—যিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে সম্মুখ-সমরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন—তাঁর বিরুদ্ধেও প্রচার করা হচ্ছে, এবং কর্ণাটকে তাঁর জন্মোৎসব পালনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলি একজোট হয়েছে। এ যেন দ্বিস্তরবিশিষ্ট এক মনোভাব—প্রথম স্তরে আছে ভারতবর্ষ যে শুধুই হিন্দুদের দেশ সেই বিশ্বাস, আর দ্বিতীয় স্তরে জমা হয়েছে মুসলমানের বিরুদ্ধে বিরাগ। এই বিরাগের সপক্ষে যুক্তি খাড়া করে জানানো হচ্ছে যে মুসলমান যেহেতু হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করেছে এবং তাদের ধর্মান্তরে বাধ্য করেছে, তাই এই বিরাগ স্বাভাবিক।

প্রথমে বিচার করা যাক ভারতবর্ষ শুধুই হিন্দুদের দেশ কি না সেই প্রশ্নটা। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা বা সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি সাধারণত তাকে 'হিন্দু' বলেই আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু এ বিষয়ে একটা বড়ো প্রশ্নচিহ্নও আছে। আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে, ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৭ আষাঢ় (অর্থাৎ ১৯২২ সালের জুন মাসে) কালিদাস নাগকে লেখা এক চিঠিতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্য ঠিক কতোখানি প্রাচীন সে বিষয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলে দিয়েছিলেন। সে চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন :

> এক সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীক পারসিক শক নানা জাতির অবাধ সমাগম ও সম্মিলন ছিল। কিন্তু মনে রেখো, সে 'হিন্দু'-যুগের পূর্ববর্তী কালে। হিন্দুযুগ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ—এই যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে সচেষ্টভাবে পাকা করে গাঁথা হয়েছিল। দুর্লঙ্ঘ্য আচারের প্রাকার তুলে একে দুষ্প্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল।
>
> (রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুমুসলমান' ৬৭২)

এই বিষয়টি পরে আমাদের আলোচনায় আবার আসবে। আপাতত এইটুকুই বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের কথায় পরিষ্কার, প্রাচীন ভারতের যে ঔদার্যের পরিচয় আমরা পাই, তথাকথিত হিন্দু যুগে এসে সেই ঔদার্য অনেকখানিই লোপ পেয়ে গেছিল। সুকুমারী ভট্টাচার্য আমাদের জানিয়েছেন যে গুপ্তযুগ থেকেই ভারতে হিন্দুধর্ম 'তার বর্তমান রূপ অর্জন করে', এবং 'সমাজপতি ও শাস্ত্রকাররা' মানুষকে

পদানত করার কাঠামোটি প্রস্তুত করে (সুকুমারী ৭৯)। তিনি আরও জানিয়েছেন, গুপ্তযুগ থেকে যে সমাজব্যবস্থা কায়েম হয় তাতে তথাকথিত 'নিম্নবর্ণের দরিদ্র, চণ্ডাল ও অস্পৃশ্য পুরুষ এবং সমস্ত নারীর স্থান ক্রমেই নেমে যেতে লাগল' (সুকুমারী ৭৭)। সুতরাং, প্রাচীন ভারতবর্ষের যে ঔদার্য ও জ্ঞানচর্চা—যার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে *কর্তার ইচ্ছায় কর্ম* রচনায় রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন প্রাচীন ভারত জানত বন্ধনই হলো অবিদ্যা, প্রকৃত মুক্তি লুকিয়ে আছে জ্ঞানচর্চার মধ্যে (রবীন্দ্রনাথ *কর্তার ইচ্ছায় কর্ম* ৫৭৫)—সেই ঔদার্য ও জ্ঞানচর্চা অনেকটাই লুপ্ত হলো, এবং বিধিনিষেধ বা কর্তৃত্বের দোহাই দিয়ে মানুষের বন্ধন দৃঢ় করে অবিদ্যার চর্চা শুরু হলো। তাই ধর্মের নামে অসহিষ্ণুতা ও সংকীর্ণতাও মাথা চাড়া দিতে শুরু করল। অনেকেই স্মরণ করতে পারেন, গুপ্ত যুগে যে *মহাভারত* কাব্য চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে সেই কাব্যের এক প্রধান চরিত্র ভীমসেনও সেই সংকীর্ণতা বা অসহিষ্ণুতা থেকে পুরোপুরি মুক্ত ছিলেন না—আদিপর্বের অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শনের সময়ে দেখা যায় কর্ণের সূতপুত্র পরিচয় পেয়ে ভীমসেন অবমাননাকর উক্তি করে কর্ণকে কুকুরের সঙ্গে তুলনা করে বলছেন, 'কুকুর যজ্ঞের পুরোডাশ খেতে পারে না, তুমিও অঙ্গরাজ্য ভোগ করতে পার না' (রাজশেখর ৬০)। বলা বাহুল্য, কর্ণকে তথাকথিত নীচজাতি মনে করে ভীমসেন এ কথা বলেছিলেন। বিধর্মী ও তথাকথিত নীচজাতির প্রতি হিন্দুদের এই ঘৃণা ও বিরাগ আমাদের দেশের সাহিত্য ও ইতিহাসে অসংখ্যবার দেখা যায়। আমরা স্মরণ করতে পারি বঙ্কিমচন্দ্রের ওই *দুর্গেশনন্দিনী* উপন্যাসের কথাই—ওসমান যখন জগৎসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছে তখন সে প্রস্তাব দিচ্ছে যে সে মারা গেলে জগৎসিংহ তাকে কবরস্থ করবে, আর জগৎসিংহ মারা গেলে সে চিতায় 'ব্রাহ্মণ দ্বারা' জগৎসিংহের সৎকার করাবে (বঙ্কিমচন্দ্র *দুর্গেশনন্দিনী* ৯২)। অর্থাৎ হিন্দুর ছোঁয়াছুঁয়ি ও জাত বিচারের সংকীর্ণতা সম্বন্ধে মুসলমান ধর্মাবলম্বী ওসমানও ওয়াকিবহাল, তাই সে নিজে হিন্দু জগৎসিংহের হাতে কবরস্থ হতে রাজি হলেও জগৎসিংহের জন্যে ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা করতে সম্মত আছে, কারণ সে জানে উঁচু জাতের হিন্দুদের জন্যে বিধর্মীদের হাতে তো নয়ই, এমনকী তথাকথিত নিচু জাতের স্বধর্মীদের হাতেও সৎকারের বিধান নেই। হিন্দু সমাজে এই আচার ও ছোঁয়াছুঁয়ির প্রাবল্য বঙ্কিম তাঁর প্রবন্ধেও স্বীকার করেছেন, 'ভারত-কলঙ্ক' লিখতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, 'হিন্দুরা যবন ম্লেচ্ছ প্রভৃতি অপর ধর্ম্মাবলম্বী জাতিগণকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন' (বঙ্কিমচন্দ্র

'ভারত-কলঙ্ক' ২৯৮)। এই প্রসঙ্গও পরে আবার আসবে, এখন শুধু এটুকুই বলা যায় যে আধুনিক যুগে এসে হিন্দুদের এই আচার-বিচারের বিধানের গুরুত্ব লোপ পেয়েছে—এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। অনেকেরই মনে পড়বে, এই একবিংশ শতাব্দীতেও ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর আসে যে ইস্কুলের মিড-ডে মিলে তথাকথিত নিচু জাতের রন্ধনকারীর হাতের রান্না খেতে অস্বীকার করেছে উঁচুজাতের পরিবারের পড়ুয়ারা—অবশ্যই সে সব ক্ষেত্রে সেই পড়ুয়াদের বাপ-মার ভূমিকাই হয়তো প্রধান থাকে। তথাকথিত নিচুজাতের প্রতি অবিচারের আরও অনেক কাহিনি শোনা যায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে।[২] বস্তুত, হিন্দু সমাজের এই ছোঁয়াছুঁয়ি ও সংকীর্ণতার প্রভাব এতই শক্তিশালী যে খোদ মহাত্মা গান্ধীও মুসলমান নেতাদের সঙ্গে একযোগে খিলাফৎ আন্দোলন পরিচালনা করলেও 'বিধর্মী' মুসলমানের সঙ্গে একাসনে বসে আহার করতে প্রস্তুত ছিলেন না (সুগত ৩২৩)। তাই মনে হয় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যই সঠিক—'হিন্দু'-যুগে প্রাচীন ভারতের ঔদার্য অনেকাংশেই লোপ পেয়েছিল। অনেকেই স্মরণ করতে পারবেন, এ-কথা জানিয়েছেন ঐতিহাসিক ও ভারততত্ত্ববিদ্ অল-বিরুণিও—তাঁর সমকালের ভারতবর্ষের হিন্দুদের আত্মশ্লাঘা দেখে তিনি লিখেছেন, 'ওঁদের পূর্বপুরুষেরা এমন হীনমতি ছিলেন না' (অল-বিরুণি ৪)। তাই প্রাচীন ভারতকে হিন্দু ভারত বলা যায় কি না তা নিয়ে বিস্তর সংশয় থাকাই স্বাভাবিক।

এই ভারতবর্ষ দেশটাও যে শুধুই হিন্দুদের—এমন যুক্তিও খুব শক্তিশালী নয় বলেই মনে হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে মহাজাতির মিলন দেখে *গীতাঞ্জলি* কাব্যগ্রন্থের ১০৬-সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড়, চীন— / শক-হুন-দল পাঠান মোগল একদেহে হল লীন'। রবীন্দ্রনাথের এ কবিতার প্রায় দুই দশক আগে 'বঙ্গদেশের কৃষক' লিখতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রও হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তের মধ্যে কোনও পার্থক্য করেন নি—হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে সকলকেই তিনি দেশের মানুষ হিসেবেই দেখেছেন। ভারতবর্ষ শুধুই হিন্দুদের দেশ—এমন কোনও ধারণাকে তিনি এখানে প্রশ্রয় দেন নি। এমনকী, বঙ্কিমচন্দ্রেরও অনেক আগে ভারতচন্দ্র রায় যখন তাঁর *অন্নদামঙ্গল*

---

২ এ বিষয়ে সাম্প্রতিক একটি বই হলো *ভেদ-ভারত : অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ ইনজাস্টিস অ্যান্ড অ্যাট্রোসিটিজ অন দলিতজ অ্যান্ড আদিবাসিজ*, সম্পাদক মার্টিন ম্যাকোয়ান, দলিত শক্তি প্রকাশন, ২০১৯